রবীন্দ্রনাথের খোঁজে সুন্দরবনে

শর্মিষ্ঠা দত্তগুপ্ত ও শিপ্রা মুখোপাধ্যায়

যে রবীন্দ্রনাথ সিলেবাসে নেই

'রবীন্দ্রনাথ কে', এই প্রশ্নের উত্তরে দক্ষিণ কলকাতার চেতলা অঞ্চলে 'শিক্ষামিত্র' নামে একটা 'অন্যধারা'-র স্কুলে বারো বছরের আন্নু খাতুন, তারই প্রায় সমবয়সী বিকি সর্দার ও তাদের বন্ধুরা বলেছিল:

'উনি খুব বড়ো ঠাকুর ছিলেন, তাই ওকে পুজো করে সবাই'।

এবং

'ও জানি, রবীন্দ্রনাথ হল নেতাজি। দেশের জন্য প্রাণ দিয়েছিল।'

'শিক্ষামিত্র'-তে ২০০৫ থেকে ২০১১ পর্যন্ত স্কুলের লাগোয়া বস্তির স্কুলছুট ছেলেমেয়েরাই পড়তে আসত। ওখানকার মাস্টারমশাই অঙ্কুর রায়চৌধুরীর কাছে আমি (শর্মিষ্ঠা) জানতে পারি কীভাবে অঙ্কুর ও তার সহকর্মীরা প্রথম বছর পঁচিশে বৈশাখে আন্নু/বিকিদের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের পরিচয় করানোর চেষ্টা করে। রবীন্দ্রনাথের জীবনের নানা গল্প, বিশেষ করে তাঁর ছেলেবেলার গল্প নিয়ে সারাদিনের আড্ডার পর ছেলেমেয়েদের মনে হতে থাকে যে রবীন্দ্রনাথ হল সেই লোক যে ওদের মতোই ঠিক করে স্কুলে যায়নি কখনো।

সে সময় 'শিক্ষামিত্র'-তে যাতায়াতের সুবাদে একটু একটু করে জানতে পারছিলাম এই 'খানিকটা' স্কুলে—যেখানে কোনো নির্দিষ্ট বোর্ডের সিলেবাস অনুসরণের পরিবর্তে নিত্যনতুন তৈরি করে নেওয়া হত পড়ানো ও পড়ার বিষয়বস্তু—কীভাবে *ডাকঘর* পড়া চলছিল মাস-ছয়েক ধরে। আন্নু/বিকি/বাপ্পা/পূজা-রা ডাকঘর শব্দটা ভেঙে 'ডাক' ও 'ঘর'-এর দুটো টুকরো দিয়ে বের করেছিল একটা নতুন খেলা এবং *ডাকঘর* বইটা হাতে নিয়ে সেখান থেকে নানা শব্দ দাগাতে দাগাতে ঠিক করেছিল কোন শব্দটা 'ডাক'-এর তালিকায় পড়বে আর কোনটা 'ঘর'-এর। গোটা পাঠ-প্রক্রিয়ায় পড়ুয়াদের মনে যেসব মূল প্রশ্ন জাগছিল, আলোচনার মধ্য দিয়ে সেগুলোর নানা সম্ভাব্য উত্তরের দিকে তারা কীভাবে এগোল, কীভাবে নিজেদের মতো করে খুঁজে পেল ডাকঘর, ডাকহরকরা, চিঠি ইত্যাদি শব্দের নানা মানে, তার টুকরোটাকরা শুনতে শুনতে চমৎকৃত হচ্ছিলাম।

প্রায় একই সময় শান্তিনিকেতনের কলাভবনে শিল্প-ইতিহাসের অধ্যাপক আমার বন্ধু সৌমিক নন্দী মজুমদার ছোটোদের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের ছবি নিয়ে আসর জমানোর একটা চেষ্টা শুরু করে। যেহেতু রবীন্দ্রসংগীত, কবিতা, গল্প, নাটক ইত্যাদির সঙ্গে স্কুল-পড়ুয়াদের কম-বেশি পরিচয় থাকলেও, রবীন্দ্রনাথের ছবির কথা বেশির ভাগেরই অজানা, সেহেতু চিত্রকর রবীন্দ্রনাথকে আবিষ্কার করতে করতে তাজ্জব বনে যাওয়া ছেলেমেয়েদের বিস্ময়কর প্রতিক্রিয়ার কথা কানে আসতে লাগল।

তিনটে ভিন্ন ধরনের স্কুলে সৌমিক রবীন্দ্রনাথের ছবি ঝোলায় পুরে যাতায়াত শুরু করেছিল সে সময়। তিনটি স্কুলে ছেলেমেয়েদের পারিবারিক ও সামাজিক প্রেক্ষাপট ভিন্ন হওয়ার দরুন, এক এক জায়গায় রবীন্দ্রনাথের ছবি পৌঁছেছিল এক এক রকম ভাবে। সাঁওতাল গ্রামের পড়ুয়ারা যেমন রবীন্দ্রনাথের আত্মপ্রতিকৃতি দেখতে দেখতে, নিজের মুখটা কেন উনি ওরকম কালিঝুলি মাখা করলেন তার সম্ভাব্য কারণ হিসেবে বলেছিল, রবীন্দ্রনাথ জানতেন না যে উনি নিজে কীরকম দেখতে ছিলেন, কেননা 'ওনার বাড়িতে আয়না ছিল না যে'। রবীন্দ্রনাথের ছবির আলোআঁধারি এভাবে ধরা দিয়েছিল তাদের কাছে, যাদের নিজেদের বাড়িতেও আয়না নেই।

এসব বিচিত্র অভিজ্ঞতার কথা শুনতে শুনতে আমার মনে হয়েছিল পাঠ্যবই-সর্বস্ব এবং পরীক্ষা-নির্ভর চিন্তাভাবনার বাইরে ছোটোদের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথকে খোঁজার এই অনন্য কাহিনিগুলো কোথাও একটা লেখা থাকা দরকার। যে রবীন্দ্রনাথ লেখাপড়া-শিক্ষার কারখানাঘরের বাইরে ছোটোদের আনতে চেয়েছিলেন, তাঁর সঙ্গে ছাত্রছাত্রীদের একটু অন্যরকমভাবে পরিচয় করানোর দু-চারটে দৃষ্টান্ত যদি মূলধারা বা অন্যধারার কোনো কোনো স্কুলে খুঁজে পাওয়া যায়, সেগুলো দু-মলাটের মধ্যে কিছুটা তুলে ধরার চেষ্টা করলে মন্দ কী? সেই অনুভব থেকেই 'স্কুলে রবীন্দ্রনাথ' নামে একটি সিরিজের কথা ভেবে বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগের কাছে প্রস্তাব দিই। গ্রন্থনবিভাগ সে প্রস্তাব গ্রহণ করলে ২০০৮ ও ২০০৯ সালে ওই সিরিজে পরপর দুটো বই বেরোয়। প্রথমটি অঙ্কুর রায়চৌধুরীর লেখা *ডাকঘর পড়ছি* ও পরেরটি সৌমিক নন্দী মজুমদারের *ছবি দেখছি*। তারপর কোনো কারণে 'স্কুলে রবীন্দ্রনাথ' সিরিজে আর বই এখনও পর্যন্ত না বেরোলেও, নানা জায়গার স্কুল-পড়ুয়াদের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথকে নতুন করে খুঁজে পাওয়ার তাগিদটা রয়েই গেল।

সে তাগিদ জোরদার হয় সুন্দরবনে বালী নামে এক দ্বীপে বিজয়নগর আদর্শ বিদ্যামন্দিরের ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে ২০০৯ সাল থেকে সম্পর্কের সূচনার পর। ওই স্কুলের ছেলেমেয়েদের নিয়ে গত বছর, অর্থাৎ ২০১২ সালে, *মুক্তধারা*-অনুপ্রাণিত একটি নাট্য প্রযোজনার সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়ায় যে স্মরণীয় অভিজ্ঞতা হয়েছিল আমাদের কয়েকজনের, প্রধানত সেটা ভাগ করে নিতে চেয়েই এই লেখা।

সুন্দরবনে কিসের টানে

আগে বলে নিই ওই স্কুল ও ওখানকার মানুষজনদের সঙ্গে আলাপ হল কীভাবে। কয়েকটি সমসাময়িক জরুরি বিষয়ে সহজ বাংলায় আলোচনা, মত-বিনিময় এবং তার মধ্য দিয়ে সচেতন নাগরিকতা তৈরির উদ্দেশ্যে 'এবং আলাপ' নামে একটা সংগঠন তৈরি করি আমরা কয়েকজন বন্ধু মিলে ২০০৩ সালে। সেই সংগঠনের কাজের সূত্রেই সুন্দরবনের গোসাবা ব্লকের বালী ২ গ্রামপঞ্চায়েতে গিয়ে পড়া বছরচারেক আগে। তার আগে কলেজ-পড়ুয়া ছেলেমেয়েদের সঙ্গে—বিশেষ করে বাংলা-মাধ্যমে পড়াশোনা করে আসা এবং মফস্বলের কলেজে পাঠরত— মূলত বিশ্বায়ন, সাম্প্রদায়িকতা ও সামাজিক লিঙ্গনির্মাণ বা জেন্ডার নিয়ে আমরা বেশকিছু আলোচনাচক্র ও কর্মশালার আয়োজন করি। সেগুলোর প্রধান উদ্দেশ্য ছিল ধারণার স্তরে কিছু পরিবর্তন আনা। পুরোনো বিষয় নতুন করে দেখতে শেখার মধ্য দিয়ে সামাজিক মানসিকতার পরিবর্তন আনা এবং বৃহত্তর অর্থে রাজনৈতিক সচেতনতার বোধ তৈরি করা সম্ভব, এই বিশ্বাস থেকেই আমরা সহজবোধ্য আলোচনার পরিসর কিছুটা বাড়াবার চেষ্টা করে যাই। সেই সুবাদে 'এবং আলাপ'-এর অন্যতম বন্ধু স্যমন্তক দাসের মাধ্যমে বালী দ্বীপের বিজয়নগর আদর্শ বিদ্যামন্দিরের প্রধান শিক্ষক সুকুমার পয়রার সঙ্গে এক আশ্চর্য যোগাযোগ ঘটে ২০০৯ সালে।

যাদবপুরের তুলনামূলক সাহিত্যের প্রাক্তন ছাত্র প্রয়াত অতনু গায়েনের হাতে ১৯৭০ সালে ওই স্কুলের গোড়াপত্তন বালী দ্বীপে। চার-পাঁচটি ছাত্র নিয়ে একটি চালাঘরে যার শুরু, সেই স্কুলেই আজ সতেরোশো ছেলেমেয়ে পড়ে পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত। ছেলে ও মেয়ের সংখ্যা প্রায় সমান সমান বিজয়নগর আদর্শ বিদ্যামন্দিরে। উচ্চবর্ণ হিন্দু পরিবারের ছেলেমেয়েদের হাতে গুনে খুঁজে পাওয়া যায়; প্রায় সকলেই যাকে বলে 'নিচু' জাত, সরকারি ভাষায় শিডিউল্ড কাস্ট। বেশিরভাগই পড়তে আসে চাষি, জেলে বা মাঝি পরিবার থেকে। এ হেন স্কুলের প্রধান শিক্ষক সুকুমারবাবু, যিনি বহু সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও স্কুলের জন্য নতুন ভাবনা ভেবে যান, যখন শোনেন যে আমরা 'এবং আলাপী'-রা প্রধানত ষোলো থেকে বাইশ বছরের ছেলেমেয়েদের প্রশ্ন করবার প্রবণতাকে উশকে দিতে চাই, তখন তাঁরই আহ্বানে আমরা ওই স্কুলে যাই চার বছর আগে। তারপর থেকে ওই স্কুল ও ওই গ্রাম পঞ্চায়েতের অনেক মানুষজনের সঙ্গে নানা সামাজিক বিষয় আলোচনা হয়েছে। সেইসঙ্গে নানা সামাজিক কুপ্রথা প্রতিরোধে (যেমন অল্প বয়সে বিয়ে ও মেয়েদের ওপর অত্যাচার) তাঁদের সঙ্গে আমাদের হাত মেলানোর মধ্য দিয়ে একটা সম্পর্ক দানা বাঁধে।

বিজয়নগর আদর্শ বিদ্যামন্দিরের কিছু ছেলেমেয়ের সঙ্গে অন্যান্য আলোচনার ফাঁকে ২০১১ সালে, অর্থাৎ রবীন্দ্র-সার্ধশতবর্ষে, আমরা দু-দিনের একটি চলচ্চিত্র উৎসবের আয়োজন করি। সেবার সত্যজিৎ রায়ের *রবীন্দ্রনাথ* ও *তিন কন্যা*, তপন সিংহের *অতিথি* এবং পূর্ণেন্দু পত্রীর *স্ত্রীর পত্র* দেখানো হয়। বালীতে গিয়ে প্রত্যেকটি ছবি নিয়ে আলোচনা করেন 'এবং আলাপ'-এর বন্ধু (যাঁকে সহব্রতী বললেই তিনি বেশি খুশি হন) শমীক বন্দ্যোপাধ্যায়। রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে সেই প্রথম ওখানকার উঁচু ক্লাসের ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে আমরা কথা বলি এবং লক্ষ করি যে সিলেবাসের অন্তর্গত দু-চারটে কবিতা ও গল্পের সূত্রে রবীন্দ্রনাথের নাম সকলের জানা থাকলেও তাঁর সম্পর্কে তাদের প্রায় কোনো ধারণাই নেই। কিন্তু *অতিথি*-র তারাপদ ও *পোস্টমাস্টার*-এর রতনকে দেখে তারা অনেক কিছু জানতে চায়। *রবীন্দ্রনাথ* ছবির ইংরেজি ধারাভাষ্য বিশেষ বোধগম্য না হলেও, রবীন্দ্রনাথের জীবন ও শান্তিনিকেতন নিয়ে ওদের একটা কৌতূহল তৈরি হয়। ওদের ভালোলাগা ও কৌতূহল স্পর্শ করে আমাদেরও। আমরা স্কুলের সঙ্গে ও নিজেদের মধ্যে আলোচনা শুরু করি যে রবীন্দ্রনাথের কোনো একটা নাটককে কেন্দ্র করে ওদের নিয়ে কাজ করলে কেমন হয়। ঠিক সেই সময় অধ্যাপিকা উমা দাশগুপ্ত আমাদের জানান রবীন্দ্র-সার্ধশতবর্ষে কেন্দ্রীয় সরকারের সংস্কৃতি মন্ত্রকের বিশেষ যোজনা— Tagore Commemoration Grant Scheme-এর কথা। উমাদির উৎসাহে সুন্দরবনের ওই স্কুলের ছেলেমেয়েদের নিয়ে *মুক্তধারা*-অনুপ্রাণিত থিয়েটার ওয়ার্কশপ ও নাটকের জন্য আমরা সংস্কৃতি মন্ত্রকে আবেদন করি এবং তা মঞ্জুর হলে শুরু হয় ওয়ার্কশপ পরিকল্পনার কাজ। সে কাজে আমাদের সহযোগী হতে রাজি হয় কলকাতার 'রণন' শিল্পীগোষ্ঠী এবং ওখানে তিন সপ্তাহ থেকে, ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে হইচই করে তারা ওয়ার্কশপ ও প্রযোজনাটি পরিচালনা করে।

কেন মুক্তধারা

মুক্তধারা-অনুপ্রাণিত একটি নাটকের কথা আমাদের মাথায় কেন এল তা ব্যাখ্যা করতে গেলে আগে বিজয়নগর আদর্শ বিদ্যামন্দির ঠিক কোথায় ও এই অঞ্চলের মানুষ কীভাবে বেঁচে আছে তা নিয়ে দু-চার কথা বলতে হয়। সরু, লম্বা বালী দ্বীপের একদিকে দুর্গাদুয়ানি নদী এবং অন্যদিকে বিদ্যা নদী। ট্রেন/বাস/গাড়িতে কলকাতা বা ক্যানিং থেকে গদখালি পর্যন্ত যাওয়ার পর নৌকোয় ঘণ্টাখানেক লাগে বিদ্যামন্দিরের ঘাটে পৌঁছতে। স্কুলের প্রায় গা দিয়ে বয়ে চলে দুর্গাদুয়ানি; নদীবাঁধের এপাশে স্কুল, ওপাশে নদী।

চারবছর আগে আয়লার দৌরাত্ম্যে বাঁধ ভেঙে জল ঢুকে এসেছিল স্কুলবাড়ির মধ্যে; একতলা প্রায় ডুবে গিয়েছিল। একটি প্রায়-ভেসে-যাওয়া ছেলেকে হেডমাস্টারমশাই কীভাবে বাঁচিয়েছিলেন তার গল্প আমরা অনেকবার শুনেছি। নদীর কাছে যাদের বাড়ি, তাদের অনেকেরই সে সময় মাথার ওপর থেকে ছাদ উড়ে গিয়েছিল। তারা সবাই স্কুলের পাকা বাড়ির দোতলায় এসে আশ্রয় নেয়। অনেকেরই বই-খাতা জলের তোড়ে ভেসে যায়; স্কুলের উদ্যোগে এবং পশ্চিমবাংলার অন্যান্য জায়গার কিছু মানুষের সাহায্যে সেসব

ক্ষয়ক্ষতি কিছুটা পূরণ হয়। নোনা জল চাষের জমিতে ছড়িয়ে যাওয়াতে সে বছর চাষ হয়নি; পরের বছরও চাষ খুব মার খেয়েছে। রাষ্ট্র ও প্রশাসনের তরফে অনেকবার কথা দেওয়া হয়েছে; কিন্তু চার বছর কেটে যাওয়ার পরও সুন্দরবনের নদী-বাঁধগুলোকে পরবর্তী বিপর্যয় মোকাবিলার জন্য বিন্দুমাত্র মজবুত করা হয়নি। অথচ প্রাকৃতিক অস্থিরতার কারণে দ্বীপবাসী মানুষের জীবনের নিরাপত্তা নদীবাঁধের ওপরই অনেকটা নির্ভরশীল।

যাঁরা সুন্দরবনের নদী-ঝড়-জলের সঙ্গে অনেক বছর ধরে যুঝছেন, প্রকৃতির ভয়াল রূপ তাঁদের অতি-পরিচিত। তা সত্ত্বেও জল-জঙ্গলের সঙ্গে এখানকার মানুষের সম্পর্ক শুধু ভয়ের নয়; সম্পর্কটা বহুমুখী। এই প্রকৃতির হাত ধরেই এখানকার মানুষ বেঁচে আছেন। তাঁরা মাছ ধরেন, জঙ্গল থেকে মধু সংগ্রহ করেন, চাষ করেন বা নৌকোয় লোক পারাপার করেন। রোজগারের তাগিদে কেউ কেউ দূরের কোনো শহর বা অন্য রাজ্যে আছেন, বা বাসন্তী-ক্যানিং-সোনারপুর অঞ্চলে কোনো চাকরি বা ব্যাবসা করেন। এখানে যাঁরা থাকেন, তাঁরা প্রকৃতিকে আঁকড়েই থাকেন। প্রকৃতির সঙ্গে তাঁদের যুঝতে যেমন হয়, তেমনই তাঁরা যা পেয়েছেন সেটা প্রকৃতির থেকেই পাওয়া।

রাষ্ট্রের দক্ষিণমুখ এখনও এই বালীদ্বীপের মানুষ দেখেননি বললেই চলে। এখানে বিদ্যুৎ আসেনি। কোনো প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র নেই। এখানকার মানুষের ভরসা কোয়্যাক বা হাতুড়ে ডাক্তার। কেউ গুরুতর অসুস্থ হলে রোগীকে প্রায় চল্লিশ মিনিট নৌকোয় করে নদীর ওপারে গোসাবায় নিয়ে যেতে হয়। সেখানে সরকারি হাসপাতাল থাকলেও আধুনিক চিকিৎসার ব্যবস্থা নামমাত্র। ন্যায়বিচার চাইলে সুন্দরবনের মানুষদের দৌড়োতে হয় কলকাতার আলিপুর আদালতে। দ্বীপগুলোর সঙ্গে মূল ভূখণ্ডের যোগাযোগ যেহেতু নদীপথে— খানিকটা খেয়ায়, খানিকটা ভ্যান/অটোয় ও তারপর ট্রেন ধরে কলকাতা গিয়ে আবার বাসে চেপে কোর্টে পৌঁছতে হয়— সেহেতু খেটে-খাওয়া মানুষের, বিশেষত মেয়েদের, পথঘাটের নানা ঝামেলা-হেনস্থার সঙ্গে যুঝে বিচার পাওয়ার জন্য এতটা দম রাখা মুশকিল। সাধারণ মানুষের স্বার্থে যোগাযোগ ও পরিবহণ ব্যবস্থার উন্নতির জন্য খুব কম কাজই হয়েছে এখানে। বাঘ ও কুমিরের কথা ভেবে এবং পর্যটকদের সুন্দরবনের প্রতি আকর্ষিত করবার প্রয়োজনে যেটুকু ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে, তার সিকিভাগ উন্নয়নও এখানকার মানুষের প্রয়োজনের কথা ভেবে করা হয়নি। তাই সুন্দরবনবাসীদের ক্ষোভ প্রধানত মানুষের বিরুদ্ধে। প্রাকৃতিক তাণ্ডবের দরুন বহু মৃত্যু ও অন্যান্য ক্ষয়ক্ষতি হয়ে থাকলেও, এখানকার মানুষকে একাই লড়তে হয়েছে মূলত। বহু বছরের অবহেলা ও বঞ্চনায় তারা অন্যত্র বসবাসকারী সুযোগসুবিধা-পাওয়া মানুষের উপর ভরসা হারিয়েছে।

তবু এ কথা কোনোভাবেই ভুলে যাওয়া যায় না যে অশক্ত ও জীর্ণ নদী-বাঁধগুলোই প্রাকৃতিক ভয়াবহতা প্রতিরোধে দ্বীপবাসী মানুষের বিরাট ভরসা। আয়লার সময় অনেক জায়গায় ওই বাঁধ ভেঙে যাওয়াতেই জলের স্রোত বাধাহীনভাবে বালীসহ আরো কয়েকটি দ্বীপে আছড়ে পড়ে। তার ফলে যে মানসিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিপর্যয় নেমে আসে, সেটা এখনও মানুষ পুরোপুরি কাটিয়ে উঠতে পারেনি। এইরকম একটা পরিস্থিতিতে বিজয়নগর আদর্শ বিদ্যামন্দিরের ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের *মুক্তধারা* নাটকটিকে কেন্দ্র করে ওয়ার্কশপের কথা ভাবা হয়তো একধরনের পাগলামিও বটে।

চারিদিকে জল নিয়ে যারা বাস করে, রাতদিন নদীর জলের মাত্রার ওপর যাদের নজর রাখতে হয়, বাঁধ ভেঙে দিয়ে অবরুদ্ধ স্রোতকে মুক্ত করার গল্প সেই মানুষরা কেমন ভাবে নেবে, তা নিয়ে আমাদের কৌতূহল ছিল। আমাদের কাছে যা মুক্তির রূপক, ওই দ্বীপের মানুষের কাছে কি তা মৃত্যুর বার্তা বহন করবে? এ প্রশ্নটা আমাদের যে ভাবায়নি তা নয়। তবে মনে হয়েছিল ওয়ার্কশপের মধ্য দিয়ে *মুক্তধারা*-র অন্যান্য পাঠ-সম্ভাবনা তৈরি হওয়া সম্ভব। দ্বীপবাসী মানুষের সঙ্গে নদী ও প্রকৃতির সম্পর্ক এবং যন্ত্র, রাষ্ট্র ও ক্ষমতা সম্পর্কে তাদের ধারণার গভীরে প্রবেশ করা যেতে পারে। একটা সম্মিলিত পাঠ-প্রক্রিয়া ও ভাবনার আদানপ্রদানের মধ্য দিয়ে *মুক্তধারা*-র দার্শনিক বোধের কাছাকাছি পৌঁছতে পারা—যে বোধ দ্বীপবাসী মানুষদের ও আমাদের আরো কাছাকাছি এনে দেবে, এই হয়তো ছিল আমাদের বাসনা।

আমরা যারা *মুক্তধারা*-অনুপ্রাণিত প্রযোজনার প্রস্তাব দিয়েছিলাম, তারা কেউ-ই নাট্যজগতের লোক নই। থিয়েটার ওয়ার্কশপ পরিচালনা ও নাট্যরূপ কল্পনার কোনো প্রশিক্ষণ বা অভিজ্ঞতা আমাদের নেই। সেজন্য *মুক্তধারা* বেছে নেওয়ার ফলে, প্রযোজনার ক্ষেত্রে বাস্তবে যে সমস্যাগুলো হতে পারে সেগুলো আমরা ততটা অনুধাবন করিনি। *মুক্তধারা*-র মতো কঠিন নাটকের প্রযোজনা পেশাদার/অভিজ্ঞ যে-কোনো শিল্পীগোষ্ঠীর কাছেই একটা বিরাট চ্যালেঞ্জ। অথচ এখানে একদল স্কুলের ছেলেমেয়েদের নিয়ে কাজ, যারা প্রায় কেউই নিয়মিত অভিনয় করে না এবং বিভিন্ন ধরনের নাটক দেখার সুযোগও যাদের নেই। তার ওপর হাতে ছিল মাত্র তিন সপ্তাহ। এইসব সমস্যার মোকাবিলা প্রধানত করতে হয়েছিল রণন শিল্পীগোষ্ঠীকেই। তিন সপ্তাহের মধ্যে *মুক্তধারা*-অনুপ্রাণিত প্রযোজনাটি কী রূপ নিল, এবার আসা যাক সে কথায়।

একেই কি বলে নাটক?

গত বছর এপ্রিলের গোড়ায় ওয়ার্কশপের শুরুটাও হয়েছিল নাটকীয়ভাবে। আমাদের পৌঁছনোর কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই প্রকৃতি আমাদের মনে করিয়ে দিল দুর্গাদুয়ানী নদীর ধারে বাঁধ ভেঙে দেওয়ার গল্প বলতে চাওয়াটা কতটা স্পর্ধার। কয়েক মুহূর্তের মধ্যে আকাশ কালো হয়ে সাংঘাতিক ঝোড়ো হাওয়া বইতে লাগল। তুমুল ঝড়। আমাদের রিহার্সালের জন্য বেশ কিছুটা ছড়ানো জায়গা দরকার বলে আমরা স্কুলের মাঠ ও স্কুলবাড়ির ছাদ বেছে নিয়েছিলাম। ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে তখন আমরা মাঠে জড়ো হয়েছি। কিন্তু প্রবল বাতাস আশেপাশের টিনের চাল উড়িয়ে নিচ্ছে দেখে আমরা মাঠের সামনে যে খোলা স্টেজের নীচে আশ্রয় নিয়েছিলাম, তা ছেড়ে ক্লাসঘরে ঢুকে এলাম। কিছুক্ষণের মধ্যেই শিলাবৃষ্টি শুরু হল এবং

বিশাল বড়ো কয়েকটি শিল অ্যাসবেস্টসের ছাদ ভেঙে সেই স্টেজের উপর এসে পড়ল। মাঠের যে শিরীষ গাছের তলার বেদি ঘিরে ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে নানারকম থিয়েটারি খেলা চলছিল, সেই গাছের ডাল ভেঙে পড়ল। সাইকেল-স্ট্যান্ডের চাল অদ্ভুত ভাবে ভাগ-ভাগ হয়ে উড়ে গিয়ে কিছু দূরে পড়ে টুকরো টুকরো হয়ে গেল। স্ক্রু-গুলো ঠিকমতন লাগানো হয়নি, বললেন প্রধান শিক্ষক সুকুমারবাবু। শীতকাল ছাড়া এই ঝড় এঁদের নিত্যসঙ্গী। ঝড় চলল সন্ধে অবধি। সেদিন ক্লাসঘরে ছেলেমেয়েদের নিয়ে বসেও বিশেষ কোনো আলোচনা করতে পারিনি আমরা। ঝড়ের দাপটে বারবারই চোখ চলে যাচ্ছিল অদূরবর্তী বাঁধের দিকে।

পরের দিন স্কুল বেলা একটায় ছুটি হয়ে গেলে আমাদের কাজ শুরু। ওয়ার্কশপের কয়েকটা দিন একটু আগে ছুটি দেওয়া হত স্কুল। সপ্তম থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত প্রায় জনাপঞ্চাশেক ছাত্রছাত্রী অংশগ্রহণ করেছিল এই ওয়ার্কশপে। তবে সাধারণত স্কুল-কলেজে যেভাবে হয়, অর্থাৎ মূল নাটক ধরে মহড়া দিয়ে, ছাত্রছাত্রীদের এক একটা ভূমিকায় কথোপকথন মুখস্থ করিয়ে স্টেজের ওপর নাটক পরিবেশন, আমরা সেইভাবে করতে চাইনি। রণন-এর পরিচালনায় আমরা চেয়েছিলাম এদের মধ্যে থিয়েটারের ধারণা নিয়ে বেশ একটু নাড়াচাড়া পড়ুক। আমাদের এটাও মনে হয়েছিল যে *মুক্তধারা* নিয়ে ছাত্রছাত্রীদের চিন্তা-ভাবনা, আলাপ-আলোচনার ভিতর দিয়ে একটা স্ক্রিপ্ট তৈরি হোক যার ভিত্তিতে প্রযোজনাটি রূপ নেবে। সবচেয়ে জরুরি অবশ্যই ছিল প্রথমে তাদের বিশ্বাস ও ভালোবাসা অর্জন করতে পারা, যেটা না হলে কোনোভাবেই ওখানকার ছেলেমেয়েদের সঙ্গে যৌথভাবে প্রযোজনাটি করা যেত না। হয়ে যেত ওপর থেকে চাপিয়ে দেওয়া একটা বোঝা— রবীন্দ্রনাথের খোঁজ যেখানে শুধুই স্কুলব্যবস্থার নিয়মমাফিক।

রণন-এর শিল্পীরা শুরু করল কিছু খেলা দিয়ে। প্রথমেই রবীন্দ্রনাথের *মুক্তধারা*-র মধ্যে প্রবেশ না করে, কয়েকটি শব্দ— যেমন গাছ, নদী, বাঁধ, রাজা— নিয়ে ছেলেমেয়েদের তিন-চার মিনিটের নাটক তৈরি করতে বলা হল। গাছ নদীর সঙ্গে কথা বললে কী বলত, নদী বাঁধকে কী বলত— এইসব। এভাবে ছোটো ছোটো কয়েকটি নাটক তৈরি হল। শুরুর দিকে নাটকগুলো সাধু ভাষায় লেখা হচ্ছিল। নাটকের সংলাপ ও ছেলেমেয়েদের নিজেদের প্রাণোচ্ছ্বাসের মধ্যে যেন ফাঁক থেকে যাচ্ছিল। আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা বই ও জীবনকে পৃথক রাখতে এতটাই সফল হয়েছে যে আমাদের কর্মশালার দুটো গোটা দিন লেগেছিল পাঠ্যবইয়ের ভাষা থেকে ছাত্রছাত্রীদের বের করে আনতে। ছাত্রছাত্রীরা আমাদের সঙ্গে কথা বলছিল কথ্য বাংলায়। প্রচুর কথা বলছে, হাসছে— কেউ লাজুক, কেউ দুষ্টু। কিন্তু তাদেরই তৈরি করা নাটকের ভাষা পালটে যাচ্ছিল, নিজেদের মতো চিন্তা করার জন্য তাদের ওশকাতে হচ্ছিল। আড় ভাঙতে শুরু করল তৃতীয় দিন। দুই দলে ভাগ করা হয়েছে সেদিন ছাত্রছাত্রীদের। একদল নদী, অন্যদল বাঁধ। নদী নিজের খেয়ালে চলবে। কিন্তু বাঁধ তার পথ রোধ করে দাঁড়াবে। হাত ধরাধরি করে দুই প্রান্তে দাঁড়িয়েছে দুই দল। বাঁধ শক্ত হয়ে রাস্তা আটকে দাঁড়িয়ে আছে আর নদীর জল ক্রমাগত ছুটে এসে ধাক্কা মারছে বাঁধের গায়ে। হাসাহাসি ধাক্কাধাক্কির মধ্যে দিয়ে ছত্রভঙ্গ হয়ে যাওয়া ছাত্রছাত্রীদের আড়ষ্টতা এবার ভাঙতে লাগল। প্রথমে ভাঙল ছেলে ও মেয়েদের মধ্যেকার অদৃশ্য দেওয়াল। তারপরে সকলেরই ভাঙল সভ্যভব্য ভাবভঙ্গি। হইহই, চিৎকার-চেঁচামেচি ও তর্কাতর্কির মধ্যে দিয়ে ক্রমে একদল দুরন্ত ও ঝগড়া-তর্কেতে যথেষ্ট তুখোড় ছেলেমেয়ে দেখতে পাওয়া গেল।

পরদিন *মুক্তধারা* নাটকের গল্প বললাম আমরা। ওয়ার্কশপ শুরুর আগে অনেকেই নাটকটা একবার পড়ে এসেছিল। কিন্তু ওয়ার্কশপের প্রথম তিন-চার দিন কোনো আলোচনা না করে ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে নাচ-গান-খেলা-অভিনয়ের মধ্যে দিয়ে *মুক্তধারা* নিয়ে কথাবার্তা বলবার জন্য প্রস্তুত হওয়াই ছিল লক্ষ্য। গল্প বলার সঙ্গে সঙ্গে ক্লাসের ব্ল্যাকবোর্ডে ছবি এঁকে সেই গল্পকে রূপ দিতে চেষ্টা করছিলাম আমরা। আগ্রহ ও বিস্ময়ের সঙ্গে গল্প শুনল বারো থেকে সতেরো বছর বয়সী ছেলেমেয়েরা। মূল নাটকের কিছু অংশ তাদের সঙ্গে পড়াও হল। তারপর দিনদুই নাটকের কয়েকটি মূল চরিত্র সম্পর্কে তাদের ভাবনা-চিন্তা নিজেদের মতো করে তারা লিখল। তাদের লেখা থেকে যে মূল প্রশ্নগুলো উঠে এসেছিল সেগুলো হল:

- রাজা বলতে আমরা কী বুঝি? এখানে রাজা কেমন?
- সাধারণ মানুষের জীবনে যন্ত্রের ভূমিকা কী? যন্ত্রের ভালোত্ব বা খারাপত্ব কি যন্ত্রের উপর নির্ভর করে না কি যে চালনা করছে তার ওপর?
- বিভূতির যন্ত্র এখানে কার, কী কাজে লেগেছিল?
- বিভূতিকে রাজা ভয় পেতেন কেন?
- প্রজারা রাজাকে ভালোবাসতেন কি?
- অভিজিৎ রাজা না হয়েও কেন সকলের মনের রাজা হয়ে উঠেছিল?
- অম্বাদের কেন বারবার স্বজন-হারা হতে হয়?

সামগ্রিকভাবে তাদের মনে হয়েছিল *মুক্তধারা*-র লোভী রাজার বিচার একচোখো এবং সেই বিচারের সঙ্গে, বাঁধের দ্বারা জল-বঞ্চিত শিবতরাইয়ের গল্পের সঙ্গে, তারা নিজেদের জীবনের অনেক মিল খুঁজে পাচ্ছে। ছেলেমেয়েরা এটাও আমাদের জানিয়ে দিল যে উত্তরকূট তাদের দ্বীপ নয়। সুন্দর সচ্ছল উত্তরকূট কলকাতার মতো কোনো জায়গা। দারিদ্র্যপীড়িত উপেক্ষিত শিবতরাইয়ের গল্প বরং তাদের গল্পের কাছাকাছি। সেই গল্পে একমাত্র আধুনিক যন্ত্র হল স্কুলবাড়ির ঠিক পিছনে বিশাল মোবাইল ফোনের টাওয়ার, যা কিনা তাদের বিচ্ছিন্ন দ্বীপবাসী জীবনে বেশ খানিকটা সুবিধে এনে দিয়েছে। রাজা-মন্ত্রী-বিভূতি-যুবরাজ-অম্বা-দের সম্পর্কে তাদের লেখা ও বলা কথা থেকে আস্তে আস্তে এটা পরিষ্কার হতে লাগল যে *মুক্তধারা* নাটকের অনেক চরিত্রকে তারা কীভাবে চিনে নিচ্ছে। প্রথমেই খুব সহজে তারা চিনে নিয়েছিল অম্বাকে। তারা অনেকে অম্বাকে চেনে। আমার ভাই যখন বিনা চিকিৎসায় মারা গেল, আমার মা এইরকম করে ঘুরে বেড়াত, বলল একটি ছেলে। জঙ্গলে মধু আনতে গিয়ে আমাদের পাড়ার অমুক যখন বাঘের হাতে পড়ল, আর ফিরে এল

না, তখন তার বউ এভাবে নদীর ধারে কেঁদে ফিরত, বলল আর একজন। *মুক্তধারা*-অনুপ্রাণিত এই প্রযোজনায় তাই একজন নয়, অনেকগুলি অম্বা ছিল। কেউ খুঁজছে সন্তান, কেউ স্বামী, কেউ ভাই বা বোনকে।

থিয়েটারে চতুর্থ দেয়ালের যে মায়াজাল থাকে, তা কিছুটা সরিয়ে দিয়ে ওয়ার্কশপের আলোচনা ও ছাত্রছাত্রীদের তৈরি ছোটো ছোটো নাটক থেকে এবার রণন তৈরি করল প্রযোজনার স্ক্রিপ্ট, সেই স্ক্রিপ্টে পাশাপাশি বয়ে চলল দুটি ধারা। একটিতে দেখা গেল *মুক্তধারা* নাটকের মহড়া চলছে বিজয়নগরের স্কুলে। ছাত্রীদের মধ্যেই একজন (সে বড়ো হয়ে পুলিশে যোগ দিতে চায় বলে কিনা জানা নেই, কিন্তু তাকেই সবাই দিদিমণি বানাতে ইচ্ছুক ছিল) শিক্ষিকার ভূমিকায় ক্লাসে ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে *মুক্তধারা* নিয়ে আলোচনা করছে। অভিনেতা-অভিনেত্রীদের লেখা/বলা কথা দিয়ে পুষ্ট হয়েছে এই ধারাটি। আর অন্যটিতে ধরা পড়েছে রবীন্দ্রনাথের *মুক্তধারা* নাটকের কয়েকটি দৃশ্য।

প্রযোজনাটি স্কুলের বাঁধানো স্টেজে না হয়ে সামনের সারা মাঠ জুড়ে হল। এককোণে কিছু বালি ও জ্বালানি-কাঠ রাখা ছিল, সেটা শিবতরাই। অন্য কোণে পাম্পকল— পানীয় জলের অফুরন্ত উৎস— আর এক সারি গাছ। সেটা উত্তরকূট। স্কুলের পিছনে মোবাইল টাওয়ার হল বিভূতির যন্ত্র। মাঝখানে শিরীষগাছের তলায় বেদির উপরে চলছে *মুক্তধারা*-র ক্লাস। স্কুলবাড়ির দোতলা-তিনতলা এবং ছাদে অনেক দর্শক আর অনেকে বসে নীচের চত্বরের নানা জায়গায়। গোটা চত্বরটাই মঞ্চ হয়ে উঠেছিল আর মাছধরার জাল, গামছা প্রভৃতি স্থানীয় মানুষের নিত্য-ব্যবহার্য জিনিসই হল মঞ্চসজ্জার উপকরণ। আব্বাসউদ্দিনের গাওয়া ভাটিয়ালি আর রবীন্দ্রসংগীত সহাবস্থান করেছিল এই প্রযোজনায়।

কিছু কিছু জায়গায় স্ক্রিপ্টে উল্লিখিত দুটি ধারার মধ্যেকার তফাত ঝাপসা হয়ে যাচ্ছিল। আবার কিছু কিছু জায়গায়, মূল *মুক্তধারা* নাটকের সঙ্গে ছাত্রছাত্রীদের তৈরি ক্লাসরুমের মহড়ার তারতম্য পরিষ্কার হয়ে উঠছিল। তফাতটা সবচেয়ে বেশি প্রকট হয় যখন বাঁধ ভেঙে দেওয়ার কথা ওঠে ও তাদের মনে প্রশ্ন জাগে যে এই বাঁধ কি তাদের পাশের চেনা নদীবাঁধ? সেই বাঁধ ভেঙে ফেললে তো তাদের সবকিছু ভেসে যাবে, যেমন গিয়েছিল আয়লার সময়! তা হলে পথ খুলে দেওয়ার মানে কী? নাটকের শেষদিকে যখন সকলকে শিহরিত করে বেজে উঠল গহন ঘন ছাইল গগন ঘনাইয়া সব চরাচর আকুল, কী হবে কে জানে, আর হঠাৎ স্কুলবাড়ির ছাদের ওপর থেকে নীচে জলের স্রোত বইয়ে দিয়ে বাঁধ ভেঙে দেওয়ার চরম মুহূর্তটি রূপায়িত হল, সেটা কি ছিল *মুক্তধারা* নাটকে ঝরনার গতি রোধ করা বাঁধ?

কোন বাঁধটা ভাঙল তবে?

কোন বাঁধটা ভাঙল সেই প্রশ্নটা আমরা ছাত্রছাত্রীদের জিজ্ঞেস করিনি। কিন্তু মধ্যে মধ্যে তাদের সঙ্গে আমাদের 'এবং আলাপী'-দের গল্প-আড্ডায় মোটামুটি যা উঠে আসে তা হল:

- আমরা এর আগে যখন নাটক করেছি তখন নিজের নিজের পার্ট করেছি। শরীরচর্চা, মনোযোগ বাড়ানো, আলাপ-আলোচনা এসবের মধ্যে দিয়ে নাটক হয় জানতাম না।
- আমরা চারিদিকে ছোটাছুটি করে নাটকটা করেছি। স্টেজে না হয়ে এরকম হওয়াতে খুব ভালো লেগেছে।
- স্কুলবাড়িটা ভৈরবের মন্দির, শিরীষগাছের তলায় ক্লাস—এসব হতে পারে কখনো ভাবিনি। মনে হচ্ছিল শান্তিনিকেতনে গাছের তলায় ক্লাস করছি।
- আমরা যেভাবে নদীপুজো করি এই নাটকেও তাই করেছি। জেলে, মাছকুড়ানি এসব চরিত্র এখানে আছে।
- রবীন্দ্রনাথের নাটকে আমাদের কথাও থাকবে এটা কে ভেবেছিল? সুন্দরবনের মানুষের কথা আমরা বলতে পেরেছি। অম্বা যেন আমাদের অম্বা।
- *মুক্তধারা*-য় যেমন রাজা দুটি রাজ্যকে সমানভাবে দেখেননি, যন্ত্র দিয়ে খাবার জল ও চাষের জল আটকে দিয়েছিলেন শিবতরাইয়ের, আমাদেরও সেরকম অনেককিছু আটকে আটকে আছে।
- এই প্রথম কোনো নাটকে আমরা যন্ত্রের কথা, প্রযুক্তি-পরিবেশের কথা পেলাম। রবীন্দ্রনাথ এতদিন আগে এসব ভেবেছিলেন?
- আমরা জানতাম রবীন্দ্রনাথ একজন বিখ্যাত কবি। কিন্তু তিনি যে বিজ্ঞান নিয়ে, যুদ্ধ নিয়ে এত ভেবেছেন; মানুষের ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করেছেন সেটা জানতাম না। উনি কীভাবে এতকিছু করলেন?

এই প্রতিক্রিয়াগুলো থেকে আমাদের প্রথমেই মনে হয় বাঁধাধরা নাটকের ধারণা থেকে বেরিয়ে আসতে পারাটা তাদের কাছে খুবই আনন্দদায়ক হয়েছিল। আমরা জানি রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে পর্দা-ফেলা মঞ্চের বাঁধাবাঁধি থেকে অভিনয়কে মুক্তি দিয়ে খোলা মাঠের মধ্যে আনতে চেয়েছিলেন; নাচ-গান-নাটক যেখানে মিলেমিশে একাকার হয়ে যায়, যেখানে মানুষ বাঁধা গতের বাইরে গিয়ে শিল্পের মাধ্যমে জীবনের অনুসন্ধান করতে পারে। এখানে সচেতনভাবে সেই ধারা অনুসরণ করবার কোনো চেষ্টা না হয়ে থাকলেও, রবীন্দ্র-ভাবনাকে হয়তো কোথাও ছুঁতে পারা গেছে। একসঙ্গে অন্যরকম করে ভাবার ও করার মধ্য দিয়ে মনের মধ্যেকার অদৃশ্য কিছু বাঁধন কেটে গিয়ে একটা আনন্দ ও মুক্তির স্বাদ পেয়েছি আমরা সকলেই।

দ্বিতীয়ত, ছেলেমেয়েরা যেভাবে *মুক্তধারা* নাটকে রাজার ভূমিকাকে দেখেছে এবং রাজা-বিভূতির আঁতাতের সঙ্গে নিজেদের বঞ্চনার যোগ খুঁজে পেয়েছে, তা থেকে বোধহয় এটা বললে ভুল হবে না যে জাতীয়তাবাদ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের ধারণার একেবারে অন্তঃস্থলে পৌঁছেছে তাদের দৃষ্টি। রবীন্দ্রনাথ বারবার দেখিয়েছেন রাষ্ট্র কীভাবে ক্ষমতারক্ষার স্বার্থে জাতীয়তাবাদের ধুয়ো তোলে এবং দানবীয় যন্ত্র ব্যবহার করে মানুষের জীবন ছারখার করে দিতে পারে। রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার অপব্যবহার ও বৃহৎ স্বার্থে কিছু করায় রাষ্ট্রের সদিচ্ছার অভাব প্রতিদিনের জীবনে এমনভাবে অনুভব করে ওই দ্বীপের ছেলেমেয়েরা, যে পুঁথিগত বিদ্যা ছাড়াও তারা নিজেদের

মতো করে আবছা বুঝতে পারে যন্ত্র কীভাবে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার প্রতীক হতে পারে। তাই নাটকে যখন তারা বাঁধ ভাঙার তোড়জোড় করে, তখন কোন বাঁধ সে সম্পর্কে ধোঁয়াশা থাকলেও তাদের নিজেদের চেনা নদীবাঁধ বা *মুক্তধারা* নাটকে ঝরনার গতি রোধ-করা বাঁধকে ছাপিয়ে গিয়ে তারা যেন সবরকম বাধার বাঁধকে চূর্ণ করার পথে এগিয়ে যায়। সব বাধা ভেসে গেলে যে নতুন পথ সামনে দেখা দেয়, অনেকটা যেন সে পথের খোঁজে। যে নাটকের নাম রবীন্দ্রনাথ প্রথমে দিয়েছিলেন *পথ*, সেই *মুক্তধারা* নাটকের দিকে তাদের সঙ্গে এভাবেই এগোই আমরা।

শান্তিনিকেতনের খোঁজ

নাটক চলাকালীন দু-একবার জেনেরেটার-চালিত মাইক বিগড়ে গিয়েছিল ঠিকই (ওখানে বিদ্যুৎ নেই যে), তবে সেই বৈশাখী দিনে ঘণ্টাখানেকের জন্য যে মায়াবী আবেশের মধ্যে আমরা সবাই ছিলাম— আর তার আগে মহড়ার দিনগুলোতেও— সে জাদু লেখায় ফুটিয়ে তোলা আমাদের কর্ম নয়। যতবারই ধরতে যাই, পিছলে পিছলে যায়। চোখের তারায় এখনও লেগে আছে নাটকের পর স্কুলের ঘাটে বিদায়বেলার দৃশ্য। গোধূলি লগ্ন, ঘাটে এসে খেয়া লেগেছে। আমাদের এগিয়ে দিতে এসেছে সবাই। কিন্তু যেতে চাওয়ার ও যেতে দেওয়ার মন কারোই নেই। আর 'রণন'-এর দাদা-দিদিদের ধরে কান্নায় ভেঙে পড়ছে কয়েকজন খুদে শিল্পী। তবু যেতে দিতে হয়।

চলে আসার আগে আবার খোঁজ পড়ে রবীন্দ্রনাথের। সেদিন অনুষ্ঠানের পর কুশীলবদের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছিল *ছেলেবেলা* বইটি। ওয়ার্কশপ করতে করতে রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে ছেলেমেয়েদের মনে নতুন করে জানবার ইচ্ছে জাগছিল, অনেক প্রশ্ন করছিল তারা। আমরা তাই তাদের *ছেলেবেলা* বইটি পড়তে বলেছিলাম আর কথা ছিল রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে ওদের সঙ্গে আবার গল্প করতে আমরা ফিরে যাব শিগগির। সেইমতো গত বাইশে শ্রাবণের আশপাশ দিয়ে আবার হাজির হলাম বালীতে। এবার আমাদের সঙ্গে শান্তিনিকেতনের তিনজন—পাঠভবনের প্রাক্তন অধ্যক্ষ সুপ্রিয় ঠাকুর, আনন্দ পাঠশালার প্রাক্তন শিক্ষিকা ও সুপ্রিয়দার স্ত্রী শুভ্রা ঠাকুর আর কলাভবনের শিক্ষক সৌমিক নন্দী মজুমদার।

সুপ্রিয়দা সঙ্গে করে নিয়ে গিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ, জোড়াসাঁকো আর শান্তিনিকেতনের প্রচুর সাদা-কালো ছবি। রবীন্দ্রনাথের কাছের মানুষদের ছবি, শান্তিনিকেতনের একেবারে গোড়ার দিকে দূরে দূরে তালগাছের সারি, ওখানকার স্থাপত্য, রামকিঙ্করের কলের বাঁশি ও সাঁওতাল পরিবার-এর ছবি থেকে শুরু করে এখনকার সময়ে শান্তিনিকেতনের ছেলেমেয়েদের নানা ক্লাস ও অনুষ্ঠানের ছবি। সৌমিক দেখাল রবীন্দ্রনাথের আঁকা প্রায় দুশো-আড়াইশো ছবি। এইসব দেখতে দেখতে নানা গল্পও হচ্ছিল। *ছেলেবেলা* বইটি পড়ে ওদের মনে কিছু প্রশ্ন জেগেছিল। রবীন্দ্রনাথ কি ছোটোবেলায় বাপ-মায়ের আদর পাননি? কিংবা যখন ছোটো ছিলেন তখন শীতকালে তাঁকে গরম পোশাক দেওয়া হত না কেন?

এসব প্রশ্ন ছাড়াও বড়োবেলার রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে তাদের কৌতূহলের বহর দেখে আমাদের তাক লেগে গেল। দেবেন্দ্রনাথ ও ব্রাহ্ম ধর্ম, রবীন্দ্রনাথের জীবনে অনুপ্রেরণার উৎস, তিনি কীভাবে এতগুলো শোক জয় করেছিলেন, তাঁর স্বদেশ পর্যায়ের গান ও দেশ সম্পর্কে তাঁর চিন্তা-ভাবনা কেমন ছিল, তিনি কি বড়োলোকদের কবি ছিলেন, তাঁর শান্তিনিকেতনের স্কুলে সুন্দরবনের গরিব ছেলেমেয়েদের জন্য পড়াশোনার কোনো সুযোগ আছে কি— এরকম বহুমাত্রিক প্রশ্ন উঠে এসেছিল বিভিন্ন সময়। প্রশ্নোত্তরের কোনো আলাদা পর্ব বেঁধে দেওয়া হয়নি। ছবি দেখতে দেখতে, গল্প শুনতে শুনতে, যার যখন যা জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে করেছে, সে তাই করেছে। আর ছিল কথা থামিয়ে মাঝেমধ্যেই নাচ-গান। রবীন্দ্রনাথের স্বদেশ পর্যায়ের গান নিয়ে কথা হচ্ছে। 'বাংলার মাটি, বাংলার জল'-এর কথা উঠল। ছাত্রছাত্রীরা অনেকেই গানটা জানে, সঙ্গে সঙ্গে সবাই মিলে ধরা হল গান। কিংবা *চিত্রাঙ্গদা*-র কথা হতে হতে নাচ-গান শুরু হয়ে গেল। শুভ্রাদি এই নাচের দলের দলপতি। দিদা-কে নাচের দলে পেয়ে সকলের উৎসাহ দ্বিগুণ। দু-দিন ধরে এভাবেই খোঁজা হয়েছিল রবীন্দ্রনাথকে আর খোলামেলা আলোচনা, হাসি, কোলাহল, নাচ-গানের মধ্যে দিয়ে শান্তিনিকেতন ঘুরেছিল আমাদের সঙ্গে সঙ্গে।

এরই মধ্যে নদীতে চর জেগে ওঠার মতো জেগে রইল একটা প্রশ্ন, যেটার কোনো সন্তোষজনক উত্তর আমরা দিতে পারিনি ওদের—রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতনের স্কুলে সুন্দরবনের গরিব ছেলেমেয়েদের জন্য পড়াশোনার কোনো সুযোগ আছে কি? থাকলে কীরকম? এর উত্তর আমাদের খানিকটা জানা থাকলেও প্রশ্নটা আমাদের ভাবাচ্ছে। রবীন্দ্রনাথের সময়ের শান্তিনিকেতন কিংবা তার পরবর্তী যুগের শান্তিনিকেতনকে তো আর এখনকার সময়ে খুঁজে পাওয়া যাবে না, খুঁজতে যাওয়াটা স্মৃতিমেদুরতা ছাড়া আর কিছু নয়। শান্তিনিকেতনের আশ্রম-বিদ্যালয় পরিচালনার ভার যাঁদের ওপর, তাঁরা যদি উত্তরটা বোলপুরের বাইরে নানা জায়গায় ছড়িয়ে দেওয়ার কথা ভাবেন, তা হলে হয়তো সমাজের নানা স্তরের ছেলেমেয়েদের কিছুটা সহজ নাগালের মধ্যে আসবে এখনকার শান্তিনিকেতন। আর আমাদের সকলেরই বোধহয় অনেক বেশি করে ভাবা দরকার রবীন্দ্র-ভাবনাকে, শান্তিনিকেতনের ধারণাকে আমরা অন্যান্য স্কুলে কীভাবে ছড়িয়ে দিতে পারি যাতে রবীন্দ্রনাথের আরো নানারকম খোঁজ আমাদের সমৃদ্ধ করতে পারে।